জসীমউদ্‌দীনের সান্নিধ্যের স্মৃতি

তিতাস চৌধুরী

কবি জসীমউদ্‌দীনকে প্রথম দেখি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিটি ইনস্টিটিউটে ১৯৫৮ সালে। সেখানে তিনি গানের দল নিয়ে এসেছিলেন। মূলত সেখানে কবিকে এক নজর দেখার জন্যই গিয়েছিলাম। কবি তাঁর দল নিয়ে গান করছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য গান ছাড়াও মশা বিষয়ক গানগুলি শ্রোতা-দর্শকের মাঝে প্রচুর humour সৃষ্টি করেছিল। এবং শ্রোতাদের মুহুমুহু করতালিতে এলঘর মুখর হয়ে উঠেছিল। খুব সম্ভব জসীমউদ্‌দীন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা চাকরি ছেড়ে সরকারের প্রচার বিভাগে যোগদান করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর দল নিয়ে স্থানীয় নিয়াজ মোহাম্মদ হাইস্কুলেও গিয়েছিলেন। সেখানেই আমি এক সুযোগে জসীমউদ্‌দীনকে তাঁর 'পলস্নী জননী' কবিতাটির পটভূমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। দেখলাম, কবি এতে বিরক্ত না হয়ে সহাস্য মুখে এর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দান করেন। আমি তাতে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে- সে স্মৃতি আজো ভুলতে পারিনি। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। কবিতাটি আমাদের পাঠ্য ছিল। সে কারণেই এ সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিল অপরিসীম।

আবার দেখি কবিকে যৌবনে কুমিলস্নায়। কুমিলস্না অলক্ত সাহিত্য পরিষদ ও অলক্ত পত্রিকার আমন্ত্রণে তিনি কুমিলস্নায় এসেছিলেন ১৬ ফেব্রম্নয়ারী ১৯৭৫ সালে। জসীম উদ্‌দীন-এর আগেও একবার কুমিলস্নায় এসেছিলেন ১৯৫০ সালে। তখন তাঁকে টাউন হলে 'নাগরিক সংবর্ধনা' দেয়া হয়েছিল। সে কথা এখন থাক্। জসীমউদ্‌দীন অলক্তের আমন্ত্রণ পেয়ে শুধু খুশিই হননি, তিনি আসার আগেই 'অলক্ত' পত্রিকার জন্য একটি কবিতাও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে তাঁর অমত্মরঙ্গ সুর ধরা পড়েছে।

কবিতার নাম 'নিমন্ত্রণ'।

'তোমার দেশেতে যাইবো বন্ধু
সবুজ ধানের ঢ়োতে,
চিরল চিরল পাতার অখরে
সামত্মনা দিও পেতে।
তরল বাঁশের বাঁশীতে সেথায়
তরল তরল সুর,
মধুর হইতে মধুর হইয়া
দূর হতে যায় দূর।
গানের পাখীরা সোয়ার হইয়া
সেই না সুরের পরে,
হৃদয় হইতে হৃদয়ে যাইয়া
উথাল-পাতাল করে।
তাহারি কিছুটা ভরিয়া আনিব
বুকের বাঁশীর সনে
দেখিব আগুনী বাড়ে কিনা কমে
সতত যা জ্বলে মনে।'

জসীম উদ্‌দীন ১৬ ফেব্রম্নয়ারী ১৯৭৫ সালে কুমিলস্নায় বিমানে এসেছিলেন বেলা একটার দিকে। কবিকে নিয়ে আমরা একটা পিকনিক করবো- তা আগেই ঠিক করা ছিল। পিকনিকের স্থান ছিল ময়নামতির শালবন বিহারে। সেখানে সারাদিন আমরা কবিকে নিয়ে পিকনিকের মেতে উঠেছিলাম। কবিও আমাদের সঙ্গে কেমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কবির একটা অভ্যাস দেখলাম- মাঝে মাঝে Joke করা। পিকনিক শেষে ময়নামতি

জাদুঘর দেখতে গিয়েও কবি প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেন। কবি যে ব্যক্তিগত জীবনে কতটা মজার মানুষ ছিলেন, তা তাঁর সঙ্গে না মেশার আগ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারত না। লক্ষ্য করেছি- গল্প কিংবা রসিকতা করার সময় কবির কোনো বয়স ছিল না। সব বয়সের
মানুষের সঙ্গেই তিনি জলের মতো মিশে যেতে পারতেন। এ গুণ সবার থাকে না, কবি জসীম উদ্‌দীনের ছিল। এখানে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি- সেদিন পিকনিকে আমাদের দলের মধ্যে একজনের নাম ছিল মোলস্না। মোলস্না নাম উচ্চারণেই কবির এক স্মৃতি মনে পড়ে যায়। কবি বলেন্নন, 'শুনুন- আমিও 'মোলস্না' ছিলাম। আমার সমস্ত্ম সনদপত্রে জসীম উদ্‌দীন মোলস্নাই লেখা আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আমি একবার একটি লেখা কবি কাজী নজরম্নল ইসলামের কাছে পাঠালে- তিনি আমার নামের মোলস্না শব্দটি কেটে শুধু জসীম উদ্‌দীন লিখে রচনাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সেই থেকেই আমি মোলস্নাহীন মোলস্না। সবার মুখেই তখন একটি প্রকান্ড হাসির নহর ছল ছল করে বয়ে যাচ্ছিল।
পিকনিক শেষে আমরা বিকেলে শহরে ফিরে আসি। কবি আমার বাসায় বিশ্রাম নেন কিছুক্ষণ। সন্ধ্যায় শুরম্ন হয় কবি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এইটে কুমিলস্না মহিলা (বর্তমানে সরকারি) কলেজের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে শ্রোতা দর্শকের তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। সবার মুখেই এক কথা- 'কবি জসীম উদ্‌দীনকে দেখতে চাই।' জসীম উদ্‌দীন যে জনতার এত কাছের মানুষে রূপান্ত্মরিত হয়ে গিয়েছিলেন- সেদিন এই অনুষ্ঠানই ছিল তাঁর প্রমাণ। অনুষ্ঠান চলে রাত দশটা পর্যন্ত্ম। আলোচনা, গান, কবিতা ইত্যাদির সমাহারে সাজানো হয়েছিল অনুষ্ঠান। কবির ভাষণ ছিল চমৎকার। তিনি এক পর্যায়ে বলেন, 'আমাদের দেশে লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির প্রতি সকলই উদাসীন- অথচ বিদেশে এর কতই কদর। আমি যে দেশেই গিয়েছি সে দেশের লোকেরাই আমাদের লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতির কথা জিজ্ঞেস করেছে, জানতে আগ্রহ দেখিয়েছে। আসলে লোক সাহিত্য ও লোকসঙ্গীত এবং লোক সংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতিই মানুষের কোন দেশের মৌল সাহিত্য ও সংস্কৃতি।
অনুষ্ঠান শেষে কবিকে নিয়ে আমি বাসায় ফিরে আসি। পথে পথে কবি কতই গল্প করলেন তার সব কথা আজ মনেও নেই। বস্ত্তত কবির আগমনে আমার বাসাটি এক রকম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মানুষের আনাগোনা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর তখনই উপলব্ধি করেছিলাম যে জসীম উদ্‌দীন ছিলেন যথার্থ অর্থেই মাটি ও মানুষের কবি। যদিও তিনি তখন কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাহলেও হবে কি। কখনো তাঁকে নিষ্প্রভ মনে হয়নি। বর্ষার সতেজ কলসীলতার মতোই আশ্চর্য একটি শ্যামলিমাকে ধারণ করে রেখিছিলেন তিনি- তাঁর প্রাণের গভীরে, সমগ্র সত্তায়। অদম্য, উদ্দীপ্ত একটি সবুজাভার উদ্ভাসন ছিল তাঁর মুখে- মুখের রেখায়। এর প্রাখর্য ছিল- তাঁর আয়ত দুই চোখের দৃষ্টিতে। কবি জসীম উদ্‌দীন সমকলের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারলেও কিছু কিছু বাসায় অবশ্য তাঁকে যেতে হয়েছিল। এবং সেই সব বাসার উৎসাহী কিছু অটোগ্রাফ শিকারীকে অটোগ্রাফও দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের পরদিন কবি কুমিলস্না মহিলা কলেজের প্রিন্সিপালের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন এবং সেখানে প্রিন্সিপাল সাহেবের পুত্রবধূ সফুরা খাতুন শেলীকে একটি অটোগ্রাফ লিখে দিয়েছিলেন।

'আঙিনার কোণে শুভ্র এ বেলী
ভোরের নেহার গায়ে মুক্তা যায় মেলি
ধবল এ রাজহংসী মানমের তীর
পার হয়ে হেথা আসি লভিয়াছে নীড়'।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রিন্সিপাল সাহেবের পুত্রবধূ খুবই সুন্দরী ছিলেন। এবং কবিও সেই ছবিটিই এঁকেছেন তাঁর প্রদত্ত অটোগ্রাফে। অইদিন দুপুরে ছিল অধ্যাপক কফিল উদ্‌দীনের বাসায় খাবার নিমন্ত্রণ। কবি সেখানেও গিয়েছিলেন এবং যথারীতি অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন কফিল সাহেবের একজন শ্যালিকা শাহজাদী বেগমকে।

'লাউয়ের কামান আছে পাহারায়

সীমলতা ছাওয়া ঘর,
তোমাদের কথা স্মরণ রাখিব
কভু না ভাবিব পর।

কফিল উদ্‌দীন সাহেবের বাসাটা ছিল লাউ আর সীমলতা আচ্ছাদিত এক কাব্যিক জগৎ। অটোগ্রাফে সে ছবিটিই আঁকা হয়েছে।

বিকেল বেলা গিয়েছিলেন ড. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের বাসায়। সেখানেও তাঁদের আপ্যায়নে কবি অভিভূত হন। আসার সময় জয়নাল সাহেবের স্ত্রী হামিদা আবেদীনকেও একটি অটোগ্রাফ লিখে দিয়েছিলেন। 'আমার একটি লক্ষ্মী দিদি অনেককালের চেনা অনেক কালই ছিলাম যেন তাহার চির চেনা। আমার বাসায়ও কবি অনেককে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। কবি জসীম উদ্‌দীনের তাৎক্ষণিক কবিতার চরণে এই অটোগ্রাফ লেখার ক্ষমতা দেখে আমি বিস্ময়বোধ করেছিলাম। সাধে কি জসীম উদ্‌দীনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'প্রকৃত কবির হৃদয় এ লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লিখবার শক্তি, নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা কখনই লিখতে পারে না।

কবি জসীম উদ্‌দীন দুই রাত আমার বাসায় ছিলেন। এই সময় তিনি আমার সঙ্গে নানা জাতের গল্প করেন। শেষ দিন রাত্রে কি মনে করে তিনি আমাকে তাঁর জীবনের প্রেমকাহিনী শুনিয়েছিলাম। কবির মৃত্যুর পর ওই প্রেমকাহিনী আমি 'অলক্ত' পত্রিকায় লিখি। এবং তা কবি আবদুল কাদিরের নজরে আসে। আবদুল কাদির তখন আমাকে জসীম উদ্‌দীনের প্রেমকাহিনী সম্পর্কে একটি চিঠি লেখেন।

১৮৭, মধুবাজার
ধানমন্ডি, রোড- ১৯
ঢাকা- ৯
২৩ এপ্রিল ১৯৭৯

১৩৮৩ সালে ৫ম বর্ষের অলক্ত পত্রিকায় তুমি জসীম উদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়া ঘাট' কাব্যের নায়িকা দুলালী বা দুলী যে শান্তি নিকেতনের 'কল্পনা' এ কথা জসীম উদ্‌দীনের মুখে শুনে সর্বস্তরে লিখেছ। কিন্তু জসীম তাঁর প্রেম কাহিনী বলতে গিয়ে আমার প্রতি অবিচার করেছে। আমিই তাঁর সেই বন্ধুটি, পত্রিকার সম্পাদক। আমি কল্পনার প্রেরিত কবিতা আমার সম্পাদিত 'জয়ন্তী পত্রিকায় ১৩৩৭ আষাঢ়ে ১ম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় ছেপেছিলাম ১৫০ পৃষ্ঠায়।

'জয়ন্তী' শান্তি নিকেতনের ঠিকানায় কল্পনা মিত্রকে পাঠালে কুমিল্লা আমাকে খুশি হয়ে পত্র দিয়েছিলেন; কিন্তু সেই পত্রতো আমি তার অনেকদিন পরে জসীমের মুখে শুনিয়ে কল্পনার কালো রূপ সে বর্ণনা করেছে দুলালী দেহের চিত্রপটে। ঃসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জসীমউদ্‌দীন' নামক বিরাটাকার গ্রন্থে সে কথা আছে। সুনীল বাবু লিখেছেন: 'জসীমের মুখে শুনি যে দুলালী শান্তি নিকেতনের কোন তরুণীর প্রতিচ্ছায়া। আমাকে জসীম তার নাম বলেছিল। ঃকিন্তু কল্পনা কি জানতেন যে তিনিই হয়েছেন জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের নায়িকা দুলালী?

শুভাকাঙ্ক্ষী
আবদুল কাদির।

১৮ ফেব্রুয়ারী ১ ১৯৭৫ সালে কবি জসীম উদ্‌দীন কুমিল্লা ত্যাগ করেন। এর পরও কবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয় না। কবি ঢাকা পৌঁছেই আমাকে চিঠি লিখেন।

ঢাকা
২৭.২.১৯৭৫
আমার আদরের ভাই তিতাস

কত যে আদর যত্ন পেয়ে এসেছি তোমাদের ওখান থেকে বিশেষ করে তোমার আর তোমার গৃহিনীর তদ্‌বীর তদারকের কথা ভোলার নয়। তোমাদের পুতুলের মতো মেয়েটি কতই আদবের। তোমরা আমার সকল

অন্তরের শুভ কামনা নিও। ঃ
তোমাদের
জসীম উদ্‌দীন
বলতেই হয়- এভাবে আমৃত্যু কবি আমাকে চিঠি লিখেছেন। স্মরণ করেছেন একটি কথা এখানে বলার আছে যে। কবির জীবদ্দশায় কবির সাহিত্য কর্ম নিয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এবং তা সওগাত পত্রিকায় পত্রস্থ হয়। এ সম্পর্কেও কবি আমাকে একখানা চিঠি লেখেন। তাতে কবির ক্ষোভও অ-প্রকাশ থাকে না।
স্নেহের ভাই তিতাস,
তোমার পত্র ও সমালোচনা পেয়ে খুশী হলাম। অনেক খেটেখুটে বই-পত্র পড়ে প্রাণের দরদ দিয়ে তুমি প্রবন্ধটি লিখেছ। তোমার প্রবন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছ- অতি আধুনিক কবিদের সঙ্গে আমার কোন যোগসূত্র নেই। আমি তাদের কাছে অপাংক্তেয়। কিন্ত' এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অপর বাংলায় অতি আধুনিক কবিদের যে সব সংকলন বের হয় তাতে আমার কবিতার স্থান দেয়া হয়। রবীন্দ্র চক্র থেকে যাঁরা বের হয়ে এলেন- আমাকে তাঁদের একজন বলে গণ্য করা হয়। শুধু এবার বাংলার কবিদের কাছে আমি অপাংক্তেয়। তাদের কবিতার দু'চারটি বাদে আমি কোনটিতেই কোন কবিত্ব খুঁজে পাই না। সকল কবির লেখাতেই সেই একই রকম অসন্'ষ্টিই, সেই একই রকম হতাশা, নিরাশা, উগ্র নাগরিক চেতনায় ভরপুর। এটা কি এপিডোমিকের মত সংক্রামক ব্যাধি? আমার লেখার কোন অনুসারী নেই- এ জন্য অভিযোগ করা হয়। অনুসারী থাকাটাই আমি অপরাধজনক মনে করি। কারো লেখার অনুসারী থাকা উচিত নয়। ঃ
একটি কথা ভেবে দেখেছ কি-? এবার বাংলার ওপার বাংলার কোন কবির লেখাই দেশের লোক গ্রহণ করতে পারছে না। তাঁদের লেখা এত ডামাডোল ও প্রশংসার গাত্র কুন্ডুয়ন সত্ত্বেও লোকপ্রিয় হতে পারে নাই।
ইতি জসীম উদ্‌দীন
৫.৬.৭৫